THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
VOL. X, Annual Issue (2023) (ISSN: 2278-2699)

কিকিরা : এক ছক ভাঙা বিস্ময়

ড. পিয়ালি দে মৈত্র *

সারসংক্ষেপ: *সাহিত্যিক বিমল করের সৃষ্টি করা চরিত্র কিঙ্কর কিশোর রায় সংক্ষেপে 'কিকিরা'। এই চরিত্রটি নিজের বুদ্ধি, বিজ্ঞানচেতনা এবং যুক্তিবোধ দিয়ে একের পর এক রহস্য উন্মোচন করেন, অথচ নিজেকে তিনি 'গোয়েন্দা' বলে চিহ্নিত করতে চান না। বহুবার বহুভাবে কিকিরার 'গোয়েন্দা' পরিচয়টি অস্বীকার করার কারণ হয়তো এটাই যে, বিমল কর চেয়েছিলেন রহস্য কাহিনির ধারায় অনুসন্ধানকারী হিসেবে এক স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি হোক বাহুবল নয়, শারীরিক সক্ষমতা নয়, শুধুমাত্র সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবোধ এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতাই যার অস্ত্র হবে। কিকিরা নিজের সম্পর্কে বলেন- 'কিকিরা দি গ্রেট' অথবা 'কিকিরা দি ম্যাজিসিয়ান'। নিজের 'ম্যাজিসিয়ান' পরিচয়টি তাঁর বেশি পছন্দের, যদিও পেশা হিসেবে ম্যাজিক দেখানো শারীরিক কারণে তিনি ত্যাগ করেছেন বহুদিন। কিকিরার বয়স, চেহারা, শারীরিক সক্ষমতা যদি তার কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয়, তবুও তার গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে তারাপদ - চন্দনের মতই পাঠকেরও এতটুকু সংশয় থাকে না। আর সেই চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছিলেন লেখক।*

সূচকশব্দ : *কিকিরা , কিঙ্কর কিশোর রায় , কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান , তারাপদ এবং চন্দন , কেটিসি বা কুটুস এজেন্সি , বিজ্ঞানমনস্কতা , যুক্তিবোধ , বিশ্লেষণী ক্ষমতা , পেশাদার গোয়েন্দা নন , হুডিনির প্রভাব।*

মূলপ্রবন্ধ : কিঙ্কর কিশোর রায় সংক্ষেপে 'কিকিরা'। নিজের সম্পর্কে যিনি বলেন- 'কিকিরা দি গ্রেট' অথবা 'কিকিরা দি ম্যাজিসিয়ান'। বিমল করের সৃষ্টি করা এমন চরিত্রটি নিজের শাণিত বুদ্ধি, বিজ্ঞানচেতনা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং যুক্তিবোধ দিয়ে একের পর এক রহস্য উন্মোচন করেন, অথচ তিনি নিজেকে 'গোয়েন্দা' বলে চিহ্নিত করতে চান না। নিজের 'ম্যাজিশিয়ান' পরিচয়টি তাঁর বেশি পছন্দের, যদিও পেশা হিসেবে ম্যাজিক দেখানো তিনি শারীরিক কারণে ত্যাগ করেছেন বহুদিন। তবুও নিজের সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেন - "আমি হলাম ম্যাজিশিয়ান। কিকিরা দি ম্যাজিসিয়ান। গোয়েন্দারা কত কি করে, রিভালবার ছোঁড়ে, নদীতে ঝাঁপ দেয়, মোটর চালায়, আমি তো রোগা-পটকা মানুষ, পিস্তল - রিভলবার বলুন আর বন্দুক বলুন - কোনোটাই আমি চালাতে পারি না। আমি নিতান্তই এক ম্যাজিশিয়ান। তাও সেকেলে ওল্ড ম্যাজিশিয়ান।" [সোনার ঘড়ির খোঁজে] কিকিরার স্রষ্টা বিমল কর নিজেও বলেছেন-"কিকিরা পেশাদার গোয়েন্দা নয়। কিকিরার কোনো গল্পকেই সেভাবে গোয়েন্দা - কাহিনী বলা যাবে না। কাজেই গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার কৌতুহল এই ধরনের গল্পে মেটার কথাও নয়। অপরাধমূলক কাহিনী বলতে যা বোঝায় কিকিরার পক্ষ মোটামুটি সেই জাতের।" [কিকিরা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ডের ভূমিকা]

বহুবার বহুভাবে কিকিরার 'গোয়েন্দা' পরিচয়টি অস্বীকার করার কারণ হয়তো এটাই যে, বিমল কর চেয়েছিলেন রহস্য - কাহিনির ধারায় অনুসন্ধানকারী হিসেবে এক স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি হোক - বাহুবল নয়, শারীরিক সক্ষমতা নয়, শুধুমাত্র সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবোধ এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতাই যার অস্ত্র হবে। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অপরাধমূলক

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
E - Mail Id: piyalidemaitra@gmail.com

কাহিনির একটি সিরিজ কিকিরা-কেন্দ্রিক কাহিনি দিয়ে গড়ে তোলার তেমন কোনো ভাবনা প্রথমদিকে লেখকের না থাকলেও পাঠকের চাহিদায় অর্থাৎ কিকিরা - কাহিনির গ্রহণযোগ্যতায় বারবার তাঁকে কলম ধরতে হয়েছে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কিকিরা-সমগ্র'র তিনটি খন্ড তার প্রমাণ। প্রথম খন্ডের ভূমিকাতে লেখক বলেছেন - "আমি কোনোদিন ভাবিনি, নিতান্ত উপন্যাস লেখার জন্য একবার 'কিকিরা'কে আসরে নামানোর পর তার জের আমার বারবার টানতে হবে। মুশকিল হয়েছে সেখানেই। নয় নয় করে অনেকবারই ভদ্রলোককে আসরে নামাতে হল।"

'কিকিরা-সমগ্র'র তিনটি খন্ড (আনন্দ পাবলিশার্স) যদি আক্ষরিক অর্থেৎ 'সমগ্র' ধরা যায়, তবে মোট সতেরটি কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে। এর বাইরে সম্ভবত আর কোনো কিকিরা কাহিনি নেই। কারণ বিমল কর তৃতীয় খন্ডের ভূমিকাতে লিখছেন- "কিকিরা চরিত্র নিয়ে লেখা আর কোনো কাহিনী আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ধরে নিতে হবে এটিই শেষ খন্ড।" লেখকের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে সতেরোটি কিকিরা-কাহিনির কথা জানা গেল [প্রথম খন্ডে পাঁচটি, দ্বিতীয় খন্ডে ছয়টি এবং তৃতীয় খন্ডে ছয়টি], তাদের প্রকাশকাল অনুযায়ী একটা তালিকা প্রস্তুত করা যায়-

(1) কাপালিকরা এখনও আছে [প্রথম সংকলন - জুন, ১৯৭৬ যদিও এটি আনন্দমেলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল]
(2) রাজবাড়ির ছোরা [জুলাই, ১৯৭৯]
(3) জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু [এপ্রিল, ১৯৮৭]
(4) শুদ্ধানন্দ ও প্রেতসিদ্ধ কিকিরা [জানুয়ারি, ১৯৯০]
(5) ময়ুরগঞ্জের নৃসিংহসদন [জানুয়ারি, ১৯৯১]
(6) সেই অদৃশ্য লোকটি [ডিসেম্বর, ১৯৯১]
(7) ঘোড়াসাহেবের কুঠি [বইমেলা, ১৯৯২]
(8) সার্কাস থেকে পালিয়ে [১লা বৈশাখ ১৪০০/১৯৯৩]
(9) হলুদ পালক বাঁধা তীর [জানুয়ারি, ১৯৯৪]
(10) তুরুপের শেষ তাস [জুলাই, ১৯৭৯]
(11) সোনার ঘড়ির খোঁজে [শারদীয় আনন্দমেলা, ১৪০২/১৯৯৫]
(12) কৃষ্ণধাম কথা [আনন্দমেলা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত]
(13) ঝিলের ধারে একদিন [শারদীয় আনন্দমেলা, ১৪০২/১৯৯৫]
(14) সোনালি সাপের ছোবল [জানুয়ারি, ১৯৯৯]
(15) হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির কফিন বাক্স [জানুয়ারি, ২০০০]
(16) নীল বানরের হাড় [জানুয়ারি, ১৯৯৯]
(17) ভুলের ফাঁদে নবকুমার [আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী, ১৪০৮/২০০১]

এই তালিকার দিকে চোখ রাখলে বোঝা যায়, প্রথম কাহিনির পর দ্বিতীয় কাহিনি রচনার কথা লেখক ভেবেছেন তিন বছর পর, তৃতীয় কাহিনিটি লেখা হচ্ছে আরও আট বছর পর এবং চতুর্থটি তৃতীয় কাহিনির তিন বছর পর। অর্থাৎ লেখক কিকিরা-কাহিনি ধারাবাহিকভাবে লেখার কোনো পরিকল্পনাই করেননি গোড়ার দিকে। চতুর্থ কাহিনি [শুদ্ধানন্দ ও প্রেতসিদ্ধ কিকিরা, প্রকাশকাল ১৯৯০] থেকে পরপর একটানা সপ্তদশ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই 'কিকিরা' প্রকাশ পেয়েছে, একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৯৬ সাল। চাহিদা এবং জোগানের সরল হিসেবে বোঝাই যায় যে, কিকিরা কাহিনি জনপ্রিয়তার নিরিখে সামনের সারিতেই ছিল। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেরই প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দুটি কাহিনি পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, একটি পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায়

(ভুলের ফাঁদে নবকুমার) এবং অপরটি আনন্দমেলার ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সংখ্যায় (কৃষ্ণধাম কথা) প্রকাশিত অর্থাৎ পাবলিকেশন হাউস একই। একটিমাত্র ব্যতিক্রম এই তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায়, সেটি 'বিকাশগ্রন্থভবন' থেকে ১৯৯২-তে প্রকাশিত (ঘোড়াসাহেবের কুঠি)।

প্রকাশকাল এবং প্রকাশকের এই বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, কিকিরা-কাহিনির বিপুল চাহিদা তথা জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করা, যে চাহিদার কারণে "নয় নয় করে অনেকবারই ভদ্রলোককে আসরে নামাতে হল।" আমরা ফিরে যাই একেবারে প্রথম কাহিনিতে - যার নাম 'কাপালিকরা এখনও আছে'। এখানেই কিকিরার সঙ্গে পাঠকের এবং পরবর্তীকালের দুই সহযোগী তারাপদ এবং চন্দনের আলাপ। ট্রেনের সহযাত্রী হিসেবে প্রথম যখন কিকিরাকে তারা দেখলো তার বর্ণনা দিয়েছে লেখক এইভাবে - "এমন সময় এক অদ্ভুত ধরনের ভদ্রলোক এসে কামরায় উঠলেন। টিয়াপাখির মত নাক, তোবড়ানো গাল, গর্তে বসা চোখ। চেহারাটি রোগাসোগা, গায়ে সেই আদ্যিকালের অলেস্টার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি, ডান হাতে একটা সুটকেস ঝুলছে, বাঁহাতে খয়েরি বালাপোশ। ভদ্রলোক এতই রোগা যে গায়ে অলেস্টার চাপিয়েও তাকে মোটা দেখাচ্ছে না। গলায় মোটা মাফলার জড়ানো।" হবু ডাক্তার চন্দন প্রথম দর্শনেই তার সম্পর্কে তারাপদর কাছে মন্তব্য করেছে - "টিপিক্যাল ডিসপেপটিক পেশেন্ট।" এমনই বিশেষত্বহীন কিকিরা-র সঙ্গে পাঠক কাহিনির পর কাহিনিতে তারাপদ এবং চন্দনের মতই অমোঘ আকর্ষণের বন্ধনে যে জড়িয়ে গেল, সেখানেই কাহিনিকারের মুনাশিয়ানা। যাদুকুর হুডিনির জীবনীর প্রভাব বিমল করের উপর পড়েছিল কিকিরা চরিত্র সৃষ্টির সময়, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন - "হুডিনি যাদুকরদের রাজা ছিলেন এ-কথা সকলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না, মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে এই মানুষটি আজীবন কীভাবে লড়াই করে গিয়েছিলেন। ভূত, প্রেত, আত্মা ইত্যাদির নাম করে কিছু লোক সাধারণ মানুষের দুর্বল মনের সুযোগ নিয়ে নানারকম কারবার ফেঁদে দিব্যি অর্থ রোজগার করত, নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়াত। হুডিনি এদের ভেল্কিবাজি বার বার ধরিয়ে দিয়েছেন।"

কিকিরা মানুষটি হুডিনি নয়, কিন্তু মনে মনে তার পরম ভক্ত। 'কাপালিকরা এখনও আছে' কাহিণীর বুনোট অসাধারণ। কাপালিক ভূজঙ্গভূষনের মুখোশ টেনে খুলে দিয়ে কীভাবে তার খপ্পর থেকে অত্যাচারিত, প্রতারিত মানুষদের সঙ্গে তারাপদ-চন্দনকেও কিকিরা উদ্ধার করলেন রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে, তা রীতিমতো প্রশংসনীয়। ম্যাজিশিয়ান বলেই কিকিরা অনায়াসে ধরতে পারেন তন্ত্র-মন্ত্রের অন্তরালে, 'ভূত নাচানো' ইত্যাদি বুজরুকির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অন্যায়কারীকে। একইরকম পাল্টা ভেলকি দেখিয়ে তারাপদ এবং চন্দনকে আশ্বস্ত-করেছেন, তাদের কাছে নিজের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাই কাহিনির শুরুতে যাকে 'ডিসপেপটিক পেশেন্ট' বলে অবহেলা করেছে চন্দন, কিছুটা সময় পর থেকে সন্দেহ করেছে, কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে- যে বন্ধুত্ব পরবর্তী কাহিনিগুলিতে ক্রমশ: গাঢ় হয়েছে, প্রায় পারিবারিক বন্ধনে পরিণত হয়েছে।

কিকিরা যে শারীরিকভাবে খুব সক্ষম ব্যক্তি নন, সে-কথাও লেখক প্রথম কাহিনিতে জানিয়ে দেন- " আমার বাঁ-হাতটায় কী যে হল - প্রথমে ব্যথা-ব্যথা করত, দেখতে দেখতে হাত শুকোতে লাগল, জোর একেবারে কমে গেল, সবসময় কাঁপত। কিকিরা তার বাঁ হাতটা দেখালেন। সত্যিই শুকনো মতন দেখতে। আঙুলগুলো বেঁকা বেঁকা, চামড়া কেমন পোড়া পোড়া রঙের। হাতটা কাঁপছিল।"

কিকিরার বয়স, চেহারা, শারীরিক সক্ষমতা যদি তার কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয়, তবুও তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তারাপদ-চন্দনের মতই পাঠকেরও এতটুকু সংশয় থাকে না। আর সেই চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছিলেন লেখক।

কিকিরা এক অদ্ভুত চরিত্র। তাঁর বাসস্থান, তাঁর পেশা, তাঁর পোশাক, তাঁর শখ, তাঁর রসবোধ - সবকিছু নিয়ে তিনি পাঠকের কাছে এক বিস্ময়। প্রথম কাহিনী থেকে তারাপদ এবং চন্দনের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখেছে পাঠক। দ্বিতীয় কাহিনি (রাজবাড়ির ছোরা) থেকেই কিকিরা তারাপদ এবং চন্দনকে তাঁর সহযোগীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের এই ত্রয়ীকে তিনি মজা

করে বলেছেন - "কেটিসি বা কুটুস্ এজেন্সি" (কিকিরা - তারাপদ - চন্দন অর্থাৎ কেটিসি)। তারাপদ কিকিরার পরিচিতির সূত্রেই বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে - মোটামুটি ভদ্রস্থ একটি বেসরকারী কোম্পানিতে কেরানীর চাকরি জুটেছে তার। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম কাহিনিতে ধার-দেনায় জর্জরিত যে তারাপদকে দেখা যায়, টুথপেস্টের অভাবে যে একটুকরো সাবানে টুথব্রাশ বুলিয়ে মুখ ধোওয়ার কাজ চালায় - কিকিরার সহায়তায় সে পরর্তীকালে একটু আরামদায়ক জীবন-যাপন করতে পেরেছে। যদিও লেখক সেই যোগসূত্রটি স্পষ্ট করেননি। দ্বিতীয় কাহিনি থেকেই দেখা যায়, কিকিরা মাঝেমধ্যেই অর্থব্যয় কর নানাবিধ শৌখিন জিনিসপত্র কিনে এনে ঘর-ভরিয়ে ফেলছেন, তারাপদ-চন্দনকে ভালো-মন্দ খাওয়াচ্ছেন- প্রথমদিকে তার আয়ের উৎস স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালের কাহিনিগুলিতে অবশ্য এই সংক্রান্ত অতি সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা আছে- "চাকরি করার মানুষ তিনি নন। তাছাড়া, উনি ধনী না হন, গচ্ছিত যথেষ্ট না থাকুক, একেবারে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা থাকবে না-এমন হতেই পারে না। অপব্যয়, বিলাসী - কোনটাই নন কিকিরা। যা আছে তাতে দুটি মানুষের (তিনি ও বগলা) দিব্যি চলে যায়। আর মাঝেমধ্যে আয়ও হয় বইকী! উঠতি ম্যাজিশিয়ানদের খেলার নকশা করে দেন, সাজ-সরঞ্জাম-কারিগরের ব্যবস্থা করেন-তাতে কিছু হাতে আসে। দু চার হাজার টাকা ওঁর ক্লায়েন্টরাও দেয়।" (সোনালি সাপের ছোবল) মনে রাখতে হবে কিকিরার আয়ের উৎস জানতে পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে চর্তুদশ কাহিনী পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত।

এবার আসা যাক্ কিকিরার বাসস্থান এবং শখের প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় কাহিনি 'রাজবাড়ির ছোরা'-তে তার বর্ণনা আছে। কিকিরার মতো কিকিরার ঘরও বিচিত্র - "পুরনো আমলের বাড়ি। বোধহয় সাহেব-সুবোতেই তৈরি করেছিল। কাঠের সিঁড়ি, মস্ত উঁচু ছাদ, কড়ি-বরগার দিকে তাকালে ভয় হয়। কিকিরার এই দোতলা ঘরটি বেশ বড়। ঘরের গা লাগিয়ে প্যাসেজ্। তারই একদিকে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা। কাজ চলার মতন বাথরুম। একচিলতে পার্টিশন করা ঘরে থাকে বগলা, কিকিরার সব্যসাচী কাজের লোক।

এমনিতেই ঘরটা মিউজিয়ামের মতন, হরেকরকম পুরনো জিনিসে বোঝাই, খাট, আলমারি দেরাজ বলে নয়, বড় বড় কাঠের বাক্স, যাত্রাদলের রাজার তরোয়াল, ফিতে জড়ানো ধনুক, পুরনো মোমদান, পর্দার টুপি, কালো আলখাল্লা, চোঙঅলা সেকেলে গ্রামাফোন, কাঠের পুতুল, রবারের এটা-সেটা, অ্যালুমিনিয়ামের এক যন্ত্র, ধুলোয় ভরা বই- আরও কত কী। কাঠের মস্ত বড় একটা বলও রয়েছে, ওটা নাকি জাদুকরের চোখ।" আসলে, লেখক খুব সচেতনভাবেই কিকিরাকে চেনা ছকের বাইরে এক আলাদা চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই প্রথম কাহিনিতেও তাকে 'গোয়েন্দা' নয়, ম্যাজিশিয়ান (প্রাক্তন) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাই তার জীবন-যাপনের ধারনাটাও আলাদা। কিকিরা চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে তার রসবোধ। নিজেদের সম্মিলিত রহস্য-সমাধানের উদ্যোগকে যেমন 'কেটিসি' নাম দিয়েছেন, তেমনি চন্দনকে মজা করে তিনি ডাকেন 'স্যান্ডেল উড' বলে। বিশেষ করে তার বিচিত্র ইংরেজি ভাষার ব্যবহার টানটান রহস্যকাহিনির মধ্যে কিছুটা ড্রামাটিক রিলিফের কাজ করে। যেমন, প্রপিতামহ-কে 'ফাদারের অলটারনেট ফাদার' বলে চিহ্নিত করা, সারা কোলকাতা জুড়ে (এমনকি কোলকাতার বাইরেও) তার বিচিত্র পেশার বিচিত্র সব বন্ধু, পিসিমার করা বয়েসের হিসেব নিয়ে মজা (সোনালি সাপের ছোবল), টেলিফোন-কে 'টেলি-ফোঁ' বলে ব্যঙ্গ করা, 'গুবলেট' করাকে 'গুবলে দিলে' বলা ইত্যাদি। এহেন রসিক 'ম্যাজিসিয়ান-ডিটেকটিভ' (শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা) তো শুধুমত্র তাঁর বিচিত্র শখ কিংবা পোষাক অথবা রসবোধের জন্য বছরের পর পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারেন না, তার মূল যে কাজ, অর্থাৎ রহস্যের সমাধান করা- সেটার অভিনবত্ব এবং নিজেস্বতা কতটা - সেটাই আমাদের বিচার্য।

১৯২৮ সালে S.S Van Dine "Twenty Rules for Writing Detective Stories" প্রবন্ধে গোয়েন্দা কাহিনি রচনার কুড়িটি নিয়মের কথা বলেছিলেন। অতি সম্প্রতি প্রাবন্ধিক সুবর্ণ বসু তিনটি সূত্রের কথা ভালো গোয়েন্দা-গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'দেশ' পত্রিকার ১৭ মার্চ ২০১৮ সংখ্যায়। তাঁর মতে, অপরাধীসহ প্রতিটি চরিত্রকে প্রথম থেকে পাঠকের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গল্পের প্রথমার্ধ বা তিন চতুর্থাংশ পেরিয়ে ভুঁইফোঁড় কোনও চরিত্র এনে তাকেই ঝপ

করে অপরাধী সাব্যস্ত করে দেওয়া যাবে না। অপরাধী সকলের চোখের সামনে থাকবে অথচ পাকাপোক্ত অ্যালিবাইয়ের জন্য তাকে সন্দেহ করা যাবে না, আবার সেই অ্যালিবাই ভেঙে সে কি করে অপরাধ সংঘটিত করছে, তা-ও নিখুঁত যুক্তিতে প্রমাণ করবে গোয়েন্দা - তা নাহলে রহস্য লেখকের মুনশিয়ানা কোথায়! দ্বিতীয়ত, গোয়েন্দার প্রতিটি চালচলনে, জেরায়, সূত্র-প্রাপ্তিতে পাঠক তাঁর সঙ্গে থাকবে। যাতে পাঠক ও তার মানস-তদন্তটি চালিয়ে যেতে পারে সমান্তরালভাবে। লেখকের দক্ষতা সেখানেই, সেখানে একই তথ্য-প্রমাণ সূত্র প্রমাণ বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দা পাঠকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং অপরাধীকে সনাক্ত করবেন। তৃতীয়ত, রহস্য বা অপরাধ যাই হোক্ না কেন, তার একটা বাস্তব সমাধান অতি প্রয়োজনীয়। কোনরকম আধ্যাত্মিক, দৈবিক, ভৌতিক বা গ্রহান্তর সম্পর্কিত কারণ এনে সমাধান করে দিলে ক্লাইম্যাক্স হিসেবে সেটা খুবই খেলো হয়ে দাঁড়ায়।(গোয়েন্দা কাহিনি: রহস্য শেষ) সুবর্ণ বসুর এই সূত্রগুলিকে সামনে রেখেই 'কিকিরা-কাহিনি'-র জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, উপরোক্ত তিনটি সূত্রের প্রতিটির সঙ্গে প্রায় সব কিকিরা কাহিনিকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। কিকিরা যেহেতু ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, সেহেতু তৃতীয় সূত্রটিকে তিনি বারবার প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। দৈবিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিকতা-র রহস্যকে সামনে রেখে যতরকম অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, একাধিক কাহিনিতে তার উল্লেখ আছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিকিরা তার সহযোগীদের নিয়ে তার বাস্তব সমাধান করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা, ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন, কাপালিকরা এখনও আছে - এই তিনটি কাহিনিতেই কিকিরার ম্যাজিশিয়ান কেরামতির পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাজিকের কৌশল জানা না থাকলে অপরাধীকে শনাক্ত করা এই কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব ছিল। যদিও কিকিরা একাধিকবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে যোগবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছেন, তবুও কোনোক্ষেত্রেই তথাকথিত 'যোগবল'-কে তিনি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি। 'রাজবাড়ির ছোরা' গল্পে কিকিরা রামপ্রসাদবাবু বলে এক দৈবজ্ঞের উপর তাঁর আস্থার কথা বলেছেন, যার অলৌকিক শক্তি আছে এবং তার সাহায্যে অদেখা কোনো কোনো ঘটনা তিনি দেখতে পান। আবার 'কাপালিকরা এখনও আছে' কাহিনিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন- "ম্যাজিক হল খেলা, তার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমি হিপ্নোটিজম এসব বিশ্বাস করি। নিজে করেছি একসময়। আমাদের দেশে অনেকে যোগ অভ্যাস করে অনেক কিছু করতে পারেন। আমার গুরু মাটির তলায় চাপা দেওয়া অবস্থায় দু-তিন ঘন্টা থাকতে পারতেন।" এই কাহিনিতে যে তিনি ভুজঙ্গভূষণ নামক কাপালিকের বুজরুকি শুধুমাত্র ম্যাজিকের কলাকৌশলের মাধ্যমে ফাঁস করে দিয়েছিলেন, সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। সামান্য উনিশ-বিশ আছে 'শুদ্ধানন্দ ও প্রেতসিদ্ধ কিকিরা' কাহিনিতে। এখানে শুদ্ধানন্দ তথা মথুরবাবু এবং তার দলবল আরও একটি বৈচিত্র্যময় বুজরুকির সাহায্য নিয়েছিলেন' - যদিও সেখানে বেশ কিছু 'কাঁচা কাজ' যে করে ফেলেছিলেন, সেটা কিকিরা অনায়াসে ধরে ফেলেছিলেন কাহিনির একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন হয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। শুদ্ধানন্দ যে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত, সেটা প্রথম থেকেই পাঠককে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্তরালে ছিল শুধু শুদ্ধানন্দ যার এজেন্ট, সেই মথুরবাবু। তারাপদ চন্দনদের মতই পাঠকও প্রথম থেকেই সূত্র খুঁজছে- কিন্তু সমাধানের চাবি শেষ পর্যন্ত কিকিরার হাতেই। ব্যঙ্গের তীব্র চাবুকের আঘাতে ভন্ডামির মুখোশ খুলছেন তিনি - "গন্ধকের গুঁড়ো ছড়িয়ে কি বোকা বানানো যায়। আর ওই মরা কাক, মড়ার খুলির মাথায় আলোর পিটপিট করে জ্বলে ওঠা। মশাই, বাচ্চাদের যে 'জ্ঞানের আলো' খেলনা পাওয়া যায়- তার ব্যাটারি আর তার নিয়ে বসে খেলা দেখানো। বলবেন, আত্মা এলে যে আলোর কাঁটা ছোটে- সেটা কী ? ঘড়িতে রেডিয়াম দেখেননি ? ছি ছি - এগুলো কি খেলা! নবিশ একেবারে! জগন্নাথের মা বলে যে জিনিসটিকে প্রেতসিদ্ধ হাজির করেছিলেন তার জন্য দুটো বেশি পয়সা খরচ করলে পারতেন। কারিগর ভালো নয়; মামুলি ডামিও করতে পারে না। নাইলনের পরদা ফেলে কত আর সামলানো যাবে। টেপ-রেকর্ডটাও খারাপ। এত কিছু শোনার পর মথুরবাবু যখন কিকিরার এই রহস্যভেদের উপায় জানতে চাইলেন, তখন বিজ্ঞান সচেতন কিকিরা তার স্বরূপ প্রকাশ করলেন- "সর্দি, রুমাল, ইনফ্রা রেড চশমা। একসময় স্পাইপারস্কোপিক বাইনোকুলার বলা

হতো যাকে, তারই একটা লেটেস্ট মডেল। আমি এই মজার চশমাটি পরে নিতাম ঘরে বসে। প্রেতসিদ্ধর চেলারা ভাবত, আমার সর্দি হয়েছে বলে নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছি। এ হল আমাদের রুমালের খেলা! চশমা বদল করে নিতাম ঘরে ঢুকে। অন্ধকারে আপনার প্রেতসিদ্ধর বাহাদুরি প্রায় সবই দেখতে পেতাম।"

'ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন'-গল্পেও আগুনের ওপর হাঁটা নিয়ে যে ভেলকিবাজি চলছিল, তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, "আগুনের ওপর হাঁটাটা খেলাই। সস্তা খেলা।" শুধু বলেননি, নিজে হেঁটে দেখিয়েছেন এবং ব্যাখাও করেছেন। নুন আর ফটকিরির গুঁড়োই যে এই খেলার মূল উপকরণ সেকথা জানিয়েছেন- "ফটকিকির আর নুনের এই গুঁড়ো পায়ে মাখো - হাতে মাখো, মেখে আগুনের ওপর পা রাখো বা হাত রাখো। তিন সেকেন্ডের বেশি রাখবে না। বড় জোর চার সেকেন্ড- তোমার কিস্যুটি হবে না। ও হল প্রিমিটিভ ব্যাপার। আজকাল শুনেছি অ্যাক্রোলাইট পলিমার সলুশান আঙুলে লাগিয়ে জলন্ত মোমবাতির শিখার ওপর আঙুল আরও বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়। তা ছাড়া অ্যাসবেসটাস দিয়ে খড়ম করেও তুমি চাপা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে দেখাতে পারো।" এর সঙ্গে ভিসানারি ইলিউশন'-কেও ব্যাখা করলেন তিনি। একটা বিষয় প্রশংসনীয়। লেখক কিকিরার রহস্য সমাধানের পদ্ধতিতে বারবার তার ম্যাজিকের কলা-কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতাকে কাজে লাগালেও, একই পদ্ধতির হুবহু পুনরাবৃত্তি অন্য কাহিনিতে নেই। 'জাদুকরের রহস্যমৃত্যু' গল্পে হারমোনিয়াম বাজানোর রহস্য উদ্ধার কিংবা 'হায়দার লেনের তেরো নাম্বার বাড়ির কফিন বাক্স' গল্পে কফিন বাক্সের গড়নের মধ্যেকার ম্যাজিক - প্রতিটি গল্পে বদলে বদলে গিয়েছে। একই অনুসন্ধান পদ্ধতি কখনোই ব্যবহৃত হয়নি।

তবে ম্যাজিশিয়ানের দক্ষতার পাশাপাশি কিকিরার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্থাৎ তার 'মগজাস্ত্র'-টিও বহু কাহিনির সমস্যা সমাধানের একমাত্র সহায়ক। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, অধিকাংশ কাহিনিতে তারাপদ এবং চন্দনের কিকিরার কথামতো কাজ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না। ব্যাপারটা যেন অনেকটা এইরকম যেহেতু কিকিরা শারীরিকভাবে খুব একটা সক্ষম মানুষ নন, সেহেতু তার পরিপূরক হিসেবে সহযোগীরা রয়েছে। যদিও 'হলুদ পালক বাঁধা তীর' নামক কাহিনিতে ডাক্তার হিসেবে চন্দনের রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতার ওপর কিকিরাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে দেখা গিয়েছে। যাই হোক, এবার আমরা একটু সেইসব কাহিনির দিকে চোখ রাখব যেখানে সেভাবে কোনো 'ম্যাজিক' নেই, অপরাধসাহিত্যের চেনা আঙ্গিকে শুধুমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণী দক্ষতাই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। যেমন ধরা যাক, ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'ঝিলের ধারে একদিন' কাহিনিটি। এই কাহিনিটির প্রেক্ষাপট কোলকাতা থেকে ৩০০ মাইল দূরের বিহারের আধা-মফস্বীলি পাহাড়তলির ছোট্ট জায়গা হবিলগঞ্জ। বেড়াতে এসে রহস্যের মুখোমুখি হয়েছে তিনজনে। এই কাহিনির বুনোট ভালো। সব থেকে বড়ো কথা, অপরাধীর প্রতি একটা মমতা তৈরী হয় কাহিনির শেষে। কারণ, স্ত্রী-পুত্রকে হারানোর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে সে। রহস্য সমাধানের জন্য লেখক ঘটনাস্থল এবং তার চারপাশের এমন একটা নিখুঁত বর্ণনা দেন না, জিওমেট্রিক প্যাটার্ণ ধরে নকশা এঁকে ফেলা যায়। এই কাহিনিতে কেউ নিজে থেকে কিকিরাকে রহস্য-সমাধানের দায়িত্ব দেয়নি, বরং বলা যেতে পারে স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই তিনি সমাধান সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন। কিকিরার বুদ্ধির জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু অপরাধী অর্থাৎ গণপতি পাঁজাই কিন্তু সমস্ত রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন। তিনি না বললে কিকিরার পক্ষে সবকিছু বিস্তারিত জানা সম্ভব ছিল না।

'ভুলের ফাঁদে নবকুমার' এরকমই আর একটি কাহিনি, যেখানে ম্যাজিকের কৌশল নয়, বুদ্ধিমত্তাই রহস্য-উদঘাটনের সহায়ক। এই কাহিনির ক্ষেত্রে যদিও সমাধানের সূত্রটি যেন বড়োই সহজ। ঘটনা-পরম্পরা সাহায্য না করলে সমাধান অধরাই থেকে যেত। 'তুরুপের শেষ তাস', 'সোনার ঘড়ির খোঁজে', 'নীল বানরের হাড়', 'সার্কাস থেকে পালিয়ে', - এই কাহিনিগুলির প্রত্যেকটাই কিকিরা-কাহিনির টানটান আকর্ষণ থেকে যেন বিচ্যুত। কিকিরার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রায় প্রতিটি কাহিনির নিয়ন্ত্রক, কিকিরার পাতা ফাঁদে অপরাধী অনায়াসে পা দিচ্ছে আর সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এগুলি তুলনামূলকভাবে দুর্বল কাহিনি। তবু এর মধ্যেও অন্য চমক আছে কোনো কোনো কাহিনিতে। যেমন, 'সার্কাস থেকে পালিয়ে' লেখাটির মধ্যে আছে

বাটারফ্লাই ট্রে'-র প্রসঙ্গ। 'কিকিরা সমগ্র' (আনন্দ পাবলিশার্স)- র দ্বিতীয় খন্ডের শেষে গ্রন্থ-পরিচয় অংশে লেখা আছে- 'সার্কাস থেকে পালিয়ে' লেখাটির মধ্যে 'বাটারফ্লাই ট্রে'-র যে প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে, সেটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ধরনের ঘটনা সত্যি-সত্যিই ঘটেছিল। যদি কারো এ বিষয়ে জানতে আগ্রহ থাকে, তবে H. Montgomery Hyde -এর 'Room 3603' বইটি সংগ্রহ করে দেখতে পারে। 'Room 3603' কোনো গল্প বা উপন্যাসের বই নয়, এর মধ্যে গত বিশ্বযুদ্ধকালের গোপন কাজকর্ম সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে।

প্রায় একইরকম অন্য একটি তথ্য পাওয়া যায় 'সোনার ঘড়ির খোঁজে' কাহিনিতে। লাজোস কোম্পানির একটি ঘড়িকে কেন্দ্র করে ঘনিয়ে ওঠে রহস্য, এমনকি অপহরণ পর্যন্ত। 'সার্কাস থেকে পালিয়ে'-তে যেমন বলা হয়েছে, হিটলারের আমলের নাজি জার্মানির হোমরা-চোমরাদের কাছে এই বাটারফ্লাই ট্রে-র অন্য কদর ছিল, হয়তো কোনো নাজি অর্গানিজেশন সিক্রেট কোনো তথ্যের জন্য এখনও এই ট্রে খুঁজে বেড়াচ্ছে - কারণ এক জার্মান ভদ্রলোক কোলকাতায় এসে ওইরকম একটা ট্রে কিনতে চেয়েছেন। একইভাবে 'সোনার ঘড়ির খোঁজে' কাহিনির শেষ প্রান্তে এসে কিকিরা 'লাজোস' কোম্পানির ম্যানেজারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য জানাচ্ছেন সকলকে। এই তথ্যের মধ্যেও হিটলারের প্রসঙ্গ এসেছে- "ঘড়িটার মালিক ছিলেন আদতে এক ইতালিয়ান ধনী। ভদ্রলোক পরে হাঙ্গেরিতে চলে যান। ১৯১৪ সালে ভদ্রলোক বুদাপেষ্ট থেকে নিখোঁজ হন পরে এক জাহাজের বরফঘরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের নাম ছিল ফিলিপপো। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না।. এই পরিবার একসময় হাঙ্গেরির জু বা ইহুদিদের মধ্যে গোপনে অনেক কাজ করত। সাঁইত্রিশ সালের আগেই অনেক ইহুদিকে এরা বিদেশে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। পরে হিটলারের সময় গোটা পরিবারকে হাঙ্গেরি থেকে তাড়িয়ে, আরও হাজার হাজার ইহুদির সঙ্গে লেবার ক্যাম্পে রেখে, অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। মাত্র একজন পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। তিনিই এখন লাজোস কোম্পানীর মালিক। এঁর নাম মোলনার। লাজোজদের পারিবারিক সংগ্রহে অনেক কিছুই একে একে জোগাড় করা হয়েছে খুঁজে পেতে। আদিপুরুষের ঘড়িটার খবর দিয়ে এখন তাঁরা সেটি ফেরত পেতে চান।" একটা ফেলে আসা সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তাকে প্রায় বাস্তবতার কাছাকাছি এনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। এই ঘড়ির প্রসঙ্গটি বাটারফ্লাই ট্রে এর মত ইতিহাস সমর্থিত নয় বোঝায় যায়, কারন সেটা হলে সে সম্পর্কে গ্রন্থ পরিচয় অংশে তথ্য দেওয়া থাকতো। ইতিহাসের সঙ্গে এই যোগসূত্রটি ছাড়া সমগ্র কাহিনি বিশেষত্বহীন। এমনকি কাহিনির শুরুতে অপহৃত তরুণটির (বাবলু) পড়ার টেবিল থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুটকে কেন্দ্র করে যে রহস্য দানা বেঁধেছিল (কারণ, তাতে FOX-OX-BOX লেখা ছিল), কাহিনির শেষে সেটিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে দেওয়া হল। বাবলু জানায়, "মাথায় এল, করে ফেললাম! অত ভাবিনি। ফক্স, অক্স, বক্স মিলে যাচ্ছিল - তাই।" ঘড়ির পেছনে মনোগ্রাম করা ছিল মালিকের নাম - ফিলিপপো ও. বি. - এটুকুই কিকিরার দেওয়া তথ্য কিন্তু শুধু এই নামের আদ্যাক্ষর দেখেই চিরকুটে লিখে ফেলাটা কাহিনি বয়নের দুর্বলতা বলে মনে হয়। তাছাড়া, প্রতিবেশীর কুকুরের সাহায্যে যেমন অনায়াসে রহস্য উদ্ধার করা হয়েছে, তাতেও রহস্যকে কিছুটা সরলীকৃত করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত - 'কৃষ্ণধাম কথা'-কে উপন্যাস নয়, বরং গল্পই বলা যায়। এই গল্পের প্রেক্ষাপট কোলকাতা থেকে দূরে জোড়া বটতলা-তে। জায়গাটি কোন জেলায় সেকথা স্পষ্ট করেননি লেখক - প্রয়োজনও ছিল না। ব্যবসায়ী হীরালাল দাস অন্তর্ধান রহস্য। এক অভিমানী বৃদ্ধের গল্প - ছেলেদের জীবনযাপনের পদ্ধতি পছন্দ না হওয়ায় নিজেই গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু যেভাবে কিকিরা তাকে ফিরিয়ে আনেন, তাতে কিকিরা কাহিনির পাঠকদের মন ভরার কথা নয়। ১৯৯৭- এর ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যার 'আনন্দমেলা'-য় প্রকাশিত কাহিনিটি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মনে হয়, এটি নেহাতই একটি দায়সারা গোছের ফরমায়েশী লেখা - অন্যান্য কিকিরা কাহিনির তুলনীয় নেহাতই দুর্বল।

'সোনালি সাপের ছোবল' (১৯১৯) কাহিনিতে আবার অনেক যত্ন করে কাহিনিকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু রহস্যের সমাধান যখন হয়েছে, তখন পাঠককে আবার হতাশ করলেন বিমল কর। অথচ বেশ টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে একটু একটু

করে কিকিরা-চন্দন-তারাপদ-র সঙ্গে পাঠকও অগ্রসর হচ্ছিল, গোয়েন্দা কাহিনির চেনা ছকের মতই নিজের মতো করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। এই উপন্যাসেও আরও একবার হরিচন্দনবাবু নামক চরিত্রটির কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কিকিরা বলেছেন- "আমি ডিটেকটিভ নই। কোনও কালেই ছিলাম না। আসলে আমি ম্যাজিশিয়ান ছিলাম এককালে। খেলা দেখাতাম। কপালদোষে আবার সেই পেশাটি চলে গেল। যাই হোক, এই কাহিনি কদমপুর নামক একটি স্থানে 'মৃণালকুঞ্জ' নামক একটি সখের বৃদ্ধাবাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বৃদ্ধাবাসের মালিক হরিচন্দনবাবুর মূল বাড়ি কোলকাতার পাথুরিঘাটায়- তিনি বনেদী বড়োলোক - নিজে কদমপুরে থাকেন না। কিকিরা যখন এই কাহিনিতে প্রবেশ করছেন, তখন বৃদ্ধাবাসে মাত্র চারজন বৃদ্ধ - মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে পরপর দুজন বৃদ্ধের (শ্রীকান্তবাবু এবং মুরলীবাবু) মৃত্যু না ঘটলে আবাসিকের সংখ্যা ছিল ছয়। মালিক হরিচন্দনবাবুর অনুরোধে ম্যানেজারের ছদ্মবেশে কিকিরা মৃত্যু-রহস্য উদঘাটনের জন্য এই বৃদ্ধাবাসে আসেন। লেখক প্রতিটি চরিত্রের বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছেন বয়স-সহ। প্রায় সকলের বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। পাঠক হিসেবে একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। মলিনবাবুর পরিচয় দেওয়ার সময় লেখক লিখেছেন - "মলিনবাবু আর গৌরবাবু মোটামুটি মাঝারি মাথার মানুষ, না-লম্বা, না-বেঁটে।" প্রশ্ন এটাই - সমগ্র কাহিনিতে এই একটি লাইনছাড়া 'গৌরবাবু' চরিত্রটির আর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই কেন ? তাছাড়া, কাহিনির প্রথম থেকেই জানানো হয়েছে, বর্তমানে আবাসিকের সংখ্যা চার। যে চারজন আবাসিকের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তারা হলো - বলাইচাঁদ দত্ত, রজনীকান্তবাবু, সলিলবাবু এবং জলধরবাবু। তাহলে এই গৌরবাবুটি কে ? কাহিনীর শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর মেলে না। আর একটি ব্যাপার হলো, সমস্যার সমাধান কিকিরা যেভাবে করেছেন, তা যেন কিছুটা যুক্তি-পারম্পর্যহীন, জোড়াতালি দেওয়া। সোজা কথায়, বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিকিরা যে কেন 'তুলসীমঞ্চকে'-কে চিহ্নিত করলেন অপরাধীকে শনাক্ত করার জন্য, সেই ব্যাখ্যা ঠিক স্পষ্ট নয়।

কিকিরা-কাহিনির আর একটি দিক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কোনো কাহিনিতেই কিন্তু পুলিশকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে তাঁকে ব্যঙ্গের চোখে দেখা হয়নি। বেশ কিছু কাহিনিতে বরং পুলিশকে সহযোগীর ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছে (ঝিলের ধারে একদিন, হলুদ পালক বাঁধা তীর)। একটা সময় পর্যন্ত শখের গোয়েন্দাদের প্রতি পুলিশদের যেমন তাচ্ছিল্য ছিল, তেমনি গোয়েন্দারাও পুলিশের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যঙ্গ করতেন - এমনটাই দেখা যেত অপরাধমূলক কাহিনিগুলিতে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক অরিন্দম দাশগুপ্ত। তাঁর বক্তব্য - "বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল শখের গোয়েন্দাকেই দাপটের সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যায়। তারা মাঝে মাঝে পুলিশের সাহায্য নেয় ঠিকই, তবে বেশিরভাগক্ষেত্রেই পুলিশ ও শখের গোয়েন্দার যৌথ প্রয়াস দেখা যায় না। কাহিনিগুলির একটা রেওয়াজই হয়ে দাঁড়ায় পুলিশকে কমিক চরিত্রে হাজির করা। পুলিশ সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা গেল প্রথম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। ভাঁড় থেকে পুলিশ হলো সহযোগী বন্ধু।" (কল্পবাস্তবের জগত, 'দেশ' ১৭ মার্চ, ২০১৮) কিকিরা কাহিনির অধিকাংশতেই 'কিকিরা'-ই যে সুপ্রিম, সে-কথা অনস্বীকার্য, তবে কোথাও কোথাও পুলিশের সরবরাহ করা তথ্য তাকে সাহায্য করেছে মাত্র - যদিও সে জাতীয় কাহিনির সংখ্যা নগণ্য।

যে কোন সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেই সময়ের প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচারও জরুরী। সাল-তারিখের হিসাব অনুযায়ী সর্বশেষ কিকিরা-র কাহিনিটি লেখা হচ্ছে ২০০১ সালের আনন্দমেলা পুজাবার্ষিকী-তে(ভুলের ফাঁদে নবকুমার)। শুধুমাত্র যুক্তিবোধ, বুদ্ধি আর বিশ্লষণী দক্ষতাতেই যদি রহস্য অনুসন্ধানকারী ('গোয়েন্দা' শব্দটি ব্যবহার করলাম না) যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেন, কোনো প্রকার প্রযুক্তির সাহায্য না নেন - তাহলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। 'ভুলের ফাঁদে নবকুমার' যখন লেখা হচ্ছে (২০০১ সাল), ততদিনে কোলকাতা দূরভাষ যন্ত্র তো বটেই, এমনকি চলভাষ যন্ত্রেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার শুধু নয়, ইন্টারনেটের ব্যবহার-ও ততদিনে বহুল প্রচলিত। অথচ, এই কাহিনিতে প্রথম কিকিরার বাড়িতে দূরভাষ যন্ত্রটি দেখা গেল। হয়তো লেখক নিজেও বুঝতে পারছিলেন, প্রযুক্তিহীন জীবন-যাপন কিকিরাকে একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যুগোপযোগী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা দিতে পারবে না। অন্যান্য উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার না করলেও সামান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য দূরভাষের ব্যবহার জরুরী। কাহিনির শুরুটাই তাই এমন - "কিকিরা ফোনে কথা বলেছিলেন। এই যন্ত্রটি তার

বাড়িতে আগে ছিল না। রাখার চেষ্টাও করেননি। ফোনের কথা উঠলে তারাপদদের ঠাট্টা করে বলতেন- তোমাদের ওই 'টেলিফোঁ' কানে তুললেই আমার ব্রেন ডেমেজ হয়ে যায়। ও:, কী বিদঘুটে সব শব্দ, হয় পটকা ফাটছে কানের পরদায়, না হয় সোঁ সোঁ হাওয়া বইছে। এই জ্যান্ত, এই মৃত। না বাপু, এই বেশ আছি, নো ঝামেলা।" লেখকের তরফ থেকে এটাই যদি জবাবদিহি হয় পাঠকের কাছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এখনই বা তার বাড়িতে কেন এসেছে যন্ত্রটি ? সেই ব্যাখাও দিয়েছেন কিকিরা-স্রষ্টা - "হালে কিকিরারই এক চেলা, ম্যাজিশিয়ান চেলা, একটা ম্যাজিক বক্সের নকসা করিয়ে নেওয়ার পর, গুরুদক্ষিণা হিসেবে যন্ত্রটি বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।" হয়তো, পরবর্তীকালে কিকিরা-কাহিনি যদি লিখতেন, আমরা অন্যান্য প্রযুক্তির খবরও পেতাম। ২০০৩ সালের আগস্টে আমরা হারাই তাকে - তাই প্রযুক্তি সচেতন কিকিরাকে পাঠকের আর চেনা হলো না।

তবুও একথা অস্বীকারের নয়, কিকিরা-কাহিনির প্রাসঙ্গিকতা তার বিজ্ঞানমনস্কতার মধ্যেই নিহিত। হুডিনির 'পরম ভক্ত' কিকিরাদের বড়ো প্রয়োজন আজও। তন্ত্র-মন্ত্র-কালোম্যাজিক-ঝাড়ফুঁক-আত্মা নামানোর মতো বুজরুকির আড়ালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে যত অন্যায় ঘটে চলেছে, তাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার জন্য কিকিরাকে প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যের পাঠক পড়ুক তার কাল্পনিক কাহিনি আর বিজ্ঞান-মঞ্চের সদস্যরা বাস্তবের কিকিরা হয়ে তাদের কাজ করুক। গত কয়েক বছরব্যাপী বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অজস্র অপরাধমূলক কাহিনির রূপায়ন দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে চেনা এবং অচেনা বহু গোয়েন্দাকে আমরা আসরে নামতে দেখলাম। 'ম্যাজিশিয়ান-গোয়েন্দা' কিকিরা তথা কিঙ্কর কিশোর রায়ের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

<u>তথ্যসূত্রঃ</u>

১ কিকিরা-সমগ্র, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

২ ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৩ কোরক সাহিত্য পত্রিকা: বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক-শারদ,১৪২০।

৪ দেশ, ১৭ মার্চ, ২০১৮

৫ [দুটি প্রবন্ধ: (i)কল্পবাস্তবের জগত / অরিন্দম দাশগুপ্ত (ii) গোয়েন্দার কাহিনিঃ রহস্য শেষ ? / সুবর্ণ বসু]